"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা প্রত্যেকদিন যা কিছু পড়ান, এই পড়াশোনায় কখনো অনুপস্থিত হয়ো না, এই পড়াশোনার দ্বারাই অন্তরের সংশয় দূর হয়ে যায়"

***প্রশ্নঃ -** বাবার হৃদয়কে জয় করার যুক্তি কী ?*

***উত্তরঃ -** বাবার হৃদয় জয় করতে হলে যতক্ষণ সংগমযুগ আছে, ততক্ষণ বাবার থেকে কিছুই লুকিয়ে রেখো না। নিজের চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। আর যদি কোনো পাপ কর্ম হয়ে যায়, তখন অবিনাশী ডাক্তারকে বললে হাল্কা হয়ে যাবে। বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হল তাঁর দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ। তাই বাবার থেকে দয়া বা কৃপা চাওয়ার পরিবর্তে, নিজেই নিজের উপর কৃপা করো। এইরকম পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নাও ।*

ওম্ শান্তি । এখন আত্মিক বাচ্চারা এটা তো জেনে গেছে যে, নতুন দুনিয়ায় হল সুখ আর পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এই দুঃখতেই সবাই দুঃখী হয়ে যায় আর সুখেতে সবাই সুখী হয়ে যায়। সুখের দুনিয়াতে দুঃখের নাম-লক্ষণও থাকবে না আবার যেখানে দুঃখ আছে সেখানে সুখেরও নাম-লক্ষণ নেই। যেখানে পাপ আছে সেখানে পুণ্যের নাম-লক্ষণ নেই, যেখানে পুণ্য আছে সেখানে পাপের নাম-লক্ষণ নেই। সেটা কোন্ জায়গা? এক হল সত্যযুগ, যেখানে কেবলই সুখ, আর অন্যটি হল কলিযুগ, সেখানে কেবলই দুঃখ । এটা তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা উচিত। এখন দুঃখের সময় সম্পূর্ণ হয়েছে আর সত্যযুগের জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমরা এখন এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ওপারে সত্যযুগ অর্থাৎ রামরাজ্যে যাচ্ছি। নতুন দুনিয়াতে হলো সুখ, পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এমন নয়, যিনি সুখ দান করেন তিনিই দুঃখ দেন। না। সুখ বাবা দেন, দুঃখ মায়া রাবণ দেয়। তাই ওই শত্রুর মূর্তি তৈরি করে প্রত্যেক বছর পোড়ানো হয়। দুঃখের প্রদাতাকে সর্বদাই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে যখন তার রাজ্য সম্পূর্ণ হয় তখন তাকে চিরদিনের জন্য শেষ করে দেওয়া হয়। পাঁচ বিকার-ই সবাইকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। তুমি এখানে বসে আছো, তবুও তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি। রাবণকে তো তোমরা বাবা বলতে পারো না। কখনো শুনেছো কি - রাবণকে পরমপিতা পরমাত্মা কেউ বলেছে ? কখনোই নয়। কেউ মনে করে যে লঙ্কাতে রাবণ ছিল। বাবা বলেন যে এই সমগ্র দুনিয়াই হলো লঙ্কা। কথিত আছে যে ভাস্কোডাগামা পরিক্রমা শুরু করেছিলেন স্টিমার বা বোটের দ্বারা। যে সময় তিনি পরিক্রমা করেছিলেন, সেই সময় এরোপ্লেন আদি ছিল না। ট্রেনও কয়লার ইঞ্জিনে চলতো। বিদ্যুৎ তো অন্য ব্যাপার । এখন বাবা বলছেন যে, দুনিয়া তো একটি-ই আছে। নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়। এইরকম তো বলা হয় না যে, স্থাপনা, পালনা, বিনাশ। না, প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ, পরে হয় পালনা, এটাই হলো সঠিক। পরবর্তীকালে আবার রাবণের পালন শুরু হয়। সেটা হলো নোংরা বিকারী পতিত হওয়ার পালনা, যার দ্বারা সবাই দুঃখী হয়ে যায়। বাবা তো কাউকে কখনো দুঃখ দেন না। এখানে তো তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। দেখো, এখন কি হয়ে গেছে! এটাই তো চলতে-ফিরতে তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আছে তো খুবই সহজ। কেবল পরমাত্মার কথা। মুসলমানরাও বলে যে উঠেই আল্লাহেক স্মরণ করো। তারা নিজেরাও খুব সকালে ওঠে। বলে যে আল্লাহ্ বা খুদাকে স্মরণ করো। তোমরা বলো, বাবাকে স্মরণ করো। 'বাবা' শব্দটি খুবই মিষ্টি। আল্লাহ্ বললে বাবার আশীর্বাদ স্মরণে আসবে না। বাবা বললে আশীর্বাদ স্মরণে এসে যায়। মুসলমানরা বাবা বলে না। তারা আবার আল্লাহ্ মিয়া বলে। মিয়া-বিবি। এইসব শব্দগুলি ভারতেই আছে। পরমপিতা পরমাত্মা বললেই শিবলিঙ্গ স্মরণে এসে যায়। ইউরোপবাসীরা আবার গডফাদার বলে থাকে। ভারতে তো নুড়ি-পাথরকেও ভগবান মনে করে। শিবলিঙ্গও পাথরের হয়ে থাকে। মনে করে যে এই পাথরের মধ্যে ভগবান বসে আছেন। ভগবানকে স্মরণ করলে তো পাথরই সামনে এসে যায়। পাথরকে ভগবান মনে করে পূজা করে। পাথর কোথা থেকে আসে ? পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্নার জল গড়াতে পাথরের উপরে পড়তে পড়তে গোল মসৃণ আকার ধারণ করে। তখন সেটা একটা প্রাকৃতিক আকার ধারণ করে। দেবী-দেবতাদের মূর্তি এই রকম হয় না। পাথর কেটে কেটে কান, মুখ, নাক, চোখ ইত্যাদি কত সুন্দর মূর্তি তৈরি করে। এর পিছনে অনেক ব্যয় করে। শিববাবার মূর্তি তৈরি করতে কোনো ব্যয় ইত্যাদির ব্যাপার নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, আমরাই সেই দেবী-দেবতা চৈতন্যস্বরূপ নিজে তৈরি হচ্ছি। যখন তোমরা চৈতন্য থাকবে, তখন তোমাদের পূজা ইত্যাদি হবে না। যখন পাথর বুদ্ধি হয়ে যাও তখনই পাথরের পূজা করা হয়। চৈতন্য আছো তো পুজ্য আছো, পরে আবার পূজারী হয়ে যাও। সত্যযুগে তো না কোনো পূজারী থাকে, আর না কোন পাথরের মূর্তি হয়। দরকারই নেই। যিনি চৈতন্য ছিলেন তাঁর চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরে

পাথরকে রাখা হয়। এখন এই দেবী-দেবতাদের কাহিনী তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে, এই দেবী-দেবতাদের জীবন কেমন ছিল ? সেটাই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পূর্বে এই জ্ঞানচক্ষু ছিল না, যেরকম পাথর বুদ্ধি ছিলে। এখন বাবার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান একই আছে কিন্তু ধারণ করে নম্বরের ক্রমানুসারে।

তোমাদের রুদ্র মালাও এই ধারণার অনুসারে তৈরি হয়। *এক হলো রুদ্র মালা, আরেকটি হলো রুন্ড মালা। এক হলো ভাইদের আর দ্বিতীয়টি হলো ভাই এবং বোনেদের*। এটা তো বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মারা হলাম খুব ছোট ছোট বিন্দুর মত। গীতও আছে ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমি আত্মা হলাম চৈতন্য স্বরূপ। একটি ছোট্ট তারার মতো। পুনরায় যখন গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করো তখন প্রথমে কত ছোট আকার হয়। পরে কতই না বড় হয়ে যায়। সেই আত্মাই নিজের শরীর দ্বারা অবিনাশী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই শরীরকেই সবাই স্মরণ করতে শুরু করে । এই শরীরই ভালো বা মন্দ হওয়ার কারণে সবাইকে আকৃষ্ট করে। সত্যযুগে এইরকম বলবে না যে, আত্ম-অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এই জ্ঞান তোমাদের এখনই প্রাপ্ত হয়। কেননা তোমরা জেনে গেছে যে, এখন আত্মা পতিত হয়ে গেছে। পতিত হওয়ার কারণে যে কর্ম করে, সেই সব কর্ম ভুল হয়ে যায়। বাবা এসে সঠিক কর্ম করতে শেখান। মায়া ভুল কর্ম করায়। সব থেকে ভুল কাজ হলো বাবাকে সর্বব্যাপী বলা। আত্মা, যে অভিনয় করে, সেটা অবিনাশী হয়। তাকে পোড়ানো যায় না, তাকে তো পূজা করা হয়। শরীরকে পোড়ানো হয়। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরকে পুড়িয়ে দেয়। আত্মা অন্য এক শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা ছাড়া শরীর দু-চারদিনও রাখা যায় না। অনেকে তো আবার শরীরের মধ্যে ওষুধ লাগিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু তাতে লাভ কি ? খ্রিস্টানদের একজন সেন্ট জেভিয়ার (স্পেনের একজন ক্যাথলিক মিশনারী, যিনি Society of Jesus এর founder) আছেন, বলে যে তার শরীর এখনো রাখা আছে। তারও এক মন্দির বানানো হয়েছে। কাউকে দেখানো হয় না, কেবলমাত্র তার পা দেখানো হয়। বলে যে কেউ যদি ওই পা-কে স্পর্শ করতে পারে তাহলে তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয় না। পা স্পর্শ করলে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। তারা মনে করে যে সে সবই তারই কৃপা। বাবা বলেন যে, বিশ্বাসের মূল্য (ভাবনার ভাড়া) পাওয়া যায়। নিশ্চয় বুদ্ধি হলে কিছু লাভ হয়। বাকিরাও এরকম হলে তো সবাই সেখানে যাবে, মেলা লেগে যাবে। স্বয়ং পরমাত্মা বাবাও এখানে আসেন, তবুও এত বেশি লোক হয় না। বেশি হলে জায়গাও দেওয়া যাবে না। যখন সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার সময় আসে তখনই বিনাশ হয়ে যায়। এই নাটকই তৈরি হয়ে আছে। এর আদি বা অন্ত নেই। তবে হ্যাঁ, কল্পবৃক্ষের জড়াজীর্ণ অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন এই বৃক্ষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই অসীম জগতের বৃক্ষ হলো অনেক বড়। প্রথমে তিনিই আসবেন, যাঁকে প্রথম নম্বরে যেতে হবে। নম্বরের ক্রমানুসারে আসবে, তাই না ? সব সূর্যবংশীরা তো একসঙ্গে আসবে না। চন্দ্রবংশীরাও সবাই একসঙ্গে আসবে না। নম্বরের ক্রমের মালানুসারে আসবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একসঙ্গে কি করে আসবে। খেলাটাই খারাপ হয়ে যাবে। এই খেলাটি একদম নিখুঁত বানানো হয়েছে, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।

মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে বসো, তখন বুদ্ধিতে এটাই স্মরণে থাকা চাই। অন্যান্য সৎসঙ্গে তো অন্য-অন্য কথাগুলি বুদ্ধিতে আসে। এখানে তো হল একটাই পড়া, যার দ্বারা তোমাদের উপার্জন হয়। ওই সব শাস্ত্রাদি পড়ে তো কিছু উপার্জন হয় না। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা তো ভালো অবশ্যই আছে । শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে বসলে এটা নয় যে সবাই নির্বিকারী হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াতে সবাই ভ্রষ্টাচারের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সেখানেই জন্ম কিভাবে হবে ? তবে বলো, সেখানে তো ৫ বিকারই থাকবে না, যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে। প্রথমেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে বাচ্চা আসছে। সেখানে বিকারের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে তো বাচ্চাদেরকেও মায়া পতিত করে দেয়। কেউ-কেউ তো আবার বাবাকে এসে শোনায়। না শোনালে ১০০ গুণ শাস্তি পেতে হবে। বাবা তো সকল বাচ্চাদেরকেই বলেন যে, কোনো পাপ কর্ম হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বাবাকে বলতে হবে। বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য। ডাক্তারকে শোনালে তোমরা হালকা হয়ে যাবে। *যতক্ষণ সঙ্গম যুগ আছে, ততক্ষণ বাবার থেকে কিছু লুকিয়ে রেখো না। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখলে, বাবার হৃদয়কে জয় করতে পারবে না*। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। স্কুলে আসবেই না তো চরিত্র কিভাবে শুধরাবে ? এইসময় সকলেরই চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। বিকারই হল প্রথম নম্বরের খারাপ চরিত্র । এইজন্য বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, কাম বিকার হলো তোমাদের মহাশত্রু। আগেও এই গীতার জ্ঞান শুনেছিলে তো এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারোনি। এখন বাবা প্রত্যক্ষ রূপে গীতা শোনাচ্ছেন। এখন বাবা বাচ্চারা, তোমাদেরকে দিব্য বুদ্ধি প্রদান করেছেন, তাই ভক্তির নাম শুনতেই তোমাদের হাসি পায় যে তোমরা তখন কি-কি করতে ! এখন তো বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন, এতে দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যাপারই নেই । নিজের উপরই দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে পুরুষার্থ করান। কেউ কেউ তো আবার পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নেয়, কেউ কেউ আবার পুরুষার্থ করতে-করতে মারাও যায় (ছেড়ে চলে যায়) । বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে একইরকম ভাবে পড়ান,

তবুও কোনো কোনো সময় এমন কিছু গুপ্ত কথা বেরিয়ে আসে, যেসব পুরানো সংশয় ছিলো, সেগুলিই পুনরায় জাগ্রত হয়, এইজন্য বাবার পড়াশোনায় কখনো অনুপস্থিত থাকবে না। মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। দিব্যগুণগুলিকে ধারণ করতে হবে। কেউ কিছু ছিঃ ছিঃ কথা বলে দেয়, তো শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... উঁচুপদ প্রাপ্ত করতে হলে মান-অপমান, দুঃখ-সুখ, হার-জিত সব সহ্য অবশ্যই করতে হবে। বাবা কত যুক্তি বলে দেন। তবুও বাচ্চারা বাবার কথাগুলিকে শুনেও শোনে না তবে তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে? বাবা বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অশরীরী না হতে পারছো, তত পর্যন্ত মায়ার কিছু না কিছু চোট লাগতেই থাকবে। বাবার কথা না মানলে তো বাবাকে অসম্মান করা হয়। তবুও বাবা বলেন, বাচ্চারা - সর্বদা বিজয় প্রাপ্ত করে জাগ্রত থাকো আর বাবাকে স্মরণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কেউ যদি কিছু উল্টো-পাল্টা কথা বলে, তবে শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... দুঃখ-সুখ, মান-অপমান সব কিছু সহ্য করতে হবে।

২) বাবা যা কিছু শোনান, সেগুলি না শুনে বাবাকে অসম্মান করবে না। মায়ার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অশরীরী থাকার অভ্যাস অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ- লৌকিক জগতের রাজকীয় ইচ্ছাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে সেবা করে নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব*

ব্যাখ্যা :- যেরকম ব্রহ্মাবাবা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, অনাসক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন, সেবার স্নেহ ছাড়া আর কোনো বন্ধন ছিল না। সেবার মধ্যেও যা কিছু লৌকিক জগতের ইচ্ছা হয়, সেগুলিও হিসাব-নিকাশের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সত্যিকারে সেবাধারী এই হিসাব-নিকাশের বন্ধন থেকেও মুক্ত থাকে। যেরকম দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন হয়, এইরকম সেবাতে স্বার্থ - এটাও হল বন্ধন। এই বন্ধন থেকে বা রাজকীয় হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্ত নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও।

স্লোগানঃ- প্রতিজ্ঞাগুলিকে ফাইলের মধ্যে না রেখে ফাইনাল (সম্পূর্ণ) হয়ে দেখাও।*